সীতা

অমর কবি মধুসূদনের অমর কাব্য মেঘনাদবধে আরও দুইটি মহীয়সী নারী-চরিত্রের বর্ণনা আছে—সীতা ও সরমা। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, সমগ্র কাব্যের মধ্যে যে জিনিসটি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা। এই পবিত্রতার অনুভূতি ও প্রেরণা মাইকেল বিদেশী কাব্য হইতে পান নাই—ইহা তিনি পাইয়াছেন ভারতীয় নারীত্বের ঐতিহ্য হইতে। ভারতীয় নারীত্বের মহিমার মর্মমূলে যে তিনি প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সীতা ও সরমার কাহিনীতে এবং মন্দোদরীর প্রসঙ্গে তাঁহার অভ্রান্ত প্রমাণ রহিয়াছে। গার্হস্থ্যজীবনের পবিত্রতা প্রদর্শন করা এই কাহিনী-প্রবর্তনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

চতুর্থ সর্গে অঙ্কিত "সীতা"-চরিত্রখানি মাইকেলের চরিত্রসৃষ্টির এক পরম বিস্ময়স্বরূপ। এ-সৃষ্টি উপাদানগত নহে, কারণ এখানে উপাদানের নূতনত্ব কিছু নাই, সমস্তই কবিগুরু বাল্মীকির কৃপাদত্ত। এ-সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা ভক্তকবির অন্তরের আরতি-আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় চরিত্রখানি চির পুরাতন হইয়াও পুনর্নবীন হইয়া উঠিয়াছে। সীতা-চরিত্রকে অমরত্ব দান করিবার জন্য বাল্মীকির অমৃত যথেষ্ট, তবে সাহিত্যে নব নব রূপের মূল্য স্বীকৃত হয় চিরকাল, সীতা-চরিত্রের সেই মূল্য এই কাব্যে যে অত্যুচ্চ হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বাল্মীকির হাতে সীতা মানবী হইয়াও দেবী, আর মধুসূদনের হাতে সীতা দেবী হইয়াও মানবী। এই যে মানবীয় স্পর্শের মহনীয় স্ফুরণ, ইহাই চরিত্রটিকে আমাদের নিকট নূতন করিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলে, আর এখানেই চরিত্রস্রষ্টার মৌলিকতা। সীতা যে 'খনির তিমির-গর্ভে সূর্য্যকান্ত মণি,' অথবা 'অম্বুরাশিতলে বিম্বাধরা রমা' অথবা 'তমোময় ধামে আভাময়ী প্রভা'—ইহাতে চমকিত হইবার কিছু নাই; কিন্তু অশোকবনেই থাকুন, আর যেখানেই থাকুন, তিনি যে 'এয়ো,' সিন্দুরহীন ললাট তাঁহার পক্ষে সাজে না, ঐ অনিন্দ্যসুন্দর ললাটে প্রয়োজন একটি প্রশস্তোজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু,—সীতার এই পরিচয়ই একমুহূর্তে আমাদের অন্তরতম হইয়া উঠে। 'এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে এ বেশ?'—। সরমার মুখে এই কথাটি বসাইয়া কবি নিজেই তাঁহার সীতা-চরিত্রের বন্দনার আয়োজন করিলেন। রাক্ষসপুরীতে দীর্ঘকাল অযত্নরক্ষিত জানকীর কপালে এয়োতি-চিহ্ন নাই, ইহা কবির অন্তরকে ব্যথিত মথিত করিয়াছে বলিয়া তিনি ঐ সীতা-সাধ্বীর সান্নিধ্যে যাইবার পূর্বে সর্বাগ্রে তাঁহাকে সিন্দুরতিলকা করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। স্বর্গের দেবীর পক্ষে এই চিহ্নের প্রয়োজন না থাকিতে পারে, কিন্তু মর্ত্যের মানবীর ইহা না থাকিলে অন্তরের মধ্যে খাঁ খাঁ করে। ঐ বিন্দুতেই সে বিধৃত করিয়া রাখে তাহার জীবনের যথাসর্বস্ব পতি-দেবতাকে, আর ঐ মাঙ্গলিক বিধৃতি যে শিব-সুন্দর ভাবের সূচনা করে তাহা আমাদের সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে যেমন আদরের তেমনই অপরিহার্য। তাই বলিতে হয়, মধুসূদন তাঁহার সীতা-চরিত্র অঙ্কনের এই প্রথম ধাপে যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সীতা যে দেবী হইয়াও মানবী, এই কথারই ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

প্রকৃতি ও মানবের অন্তররাজ্যে যাহা কিছু তরুণ ও যাহা কিছু প্রবীণ, সে সমস্তই এই সীতা-চরিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। তাঁহাকে কখনও মনে হয় একটি চিরনবীন কিশলয় মাত্র, আবার কখনও চিরজাগ্রতা বন-দেবী; তিনি কখনও শিশুর তারল্যে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন, আবার, কখনও বা প্রেম-প্রৌঢ়ার ন্যায় পতিপ্রেমের মাহাত্ম্য-স্রোতে অবগাহন করিতেছেন। মনের এই অসাধারণ পেলবতার বলেই সীতা রাজার নন্দিনী রঘু কুল-বধূ হইয়াও পঞ্চবটী বনে এমন সুখে কাল কাটাইতেন যাহা শুনিয়া সরমার রাজসুখে ঘৃণা জন্মিয়া গেল; ইচ্ছা হইল, রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া তিনিও বন-বাসে চলিয়া যান। সমগ্র প্রকৃতির সহিত এই নারীর হৃদয় নিবিড়ভাবে গ্রথিত হইয়াছিল। সর্বজীবে দয়া, প্রীতি, সেবা, সমবেদনা, কৃতজ্ঞতা, আতিথ্য ইত্যাদি অমূল্য আন্তর সম্পদের তিনি এমন এক দানসত্র খুলিলেন যাহার ছত্রতলে বস্তুজগৎও তাঁহার স্পর্শে জীবন্ত; প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণী আসিয়া মুগ্ধ, তৃপ্ত ও ধন্য হইল। কেবল প্রাণী নহে, এককথায় সেখানকার যাবতীয় সত্তার সহিত তাঁহার গভীর আত্মীয়তা, শিশুর সরলতা ও অপরিসীম দরদ অন্তরকে উদ্বেলিত করিত বলিয়া অরণ্যের সেই ভীষণ নির্জনতা তাঁহাকে এতটুকু কাতর করিতে পারিত না। তরুলতা ও পশুপক্ষী লইয়া তিনি এক-সোনার সংসার গড়িয়াছিলেন:

নব লতিকার

"নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাসি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।"

এই কল্পনাঢ্য লিরিক ঝংকার নিছক কবিকৃতি নহে, সীতা-চরিত্রেরও এক উজ্জ্বল দিগ্‌দর্শক।

জানকী জনমদুঃখিনী ; কিন্তু এই দুঃখের অগ্নিশিখায় তিনি কাহাকেও উত্তপ্ত করিতে চাহেন না। 'এ অভাগী, হায়, লো সুভগে, যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে এ জগতে ?' এই কথায় ফুটিয়া উঠে নারীর যে সর্বংসহ রূপ, তাহাতে একমাত্র সীতাই সীতার তুলনীয়া। দুঃখের আগুনে তিনি যতই জ্বলিতেছেন, ততই ফুটিতেছে তাঁহার ঐ সর্বংসহারূপের অম্লান জ্যোতি। অকুণ্ঠ পতিপ্রেম হইতে তাঁহার অন্তরে জাগিয়াছে এমন এক অপার্থিব তেজ যাহার বলে তিনি দুর্দান্ত-রাক্ষস-কবলিতা হইয়াও আত্মবিস্মৃত হন নাই, আপন উদ্ভাবনী শক্তিতে সেই পৈশাচিক চৌর্যের পথ যাহাতে নিষ্কণ্টক না থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে অঙ্গের অলঙ্কার নিক্ষেপ করিতে থাকেন। পতির গরবে গরবিনী তিনি ; পর্বতোপরি বিশাল রসাল-মূলে ব্রততীর ন্যায় তিনি যে নাথের চরণতলে বসিয়া সেই শ্রীমুখ-নিঃসৃত নানা কথা শুনিতেন—সেই পূর্বকথা স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার মনে হইতেছে, তাঁহাদের সেই আলাপ, কৈলাসের হর-গৌরীর আলাপেরই সমপর্যায়ের। সুতরাং অন্তর যাঁহার সু-উচ্চ সুখ-স্মৃতিতে ভরা, পার্থিব নির্যাতনে তাঁহার কী করিবে ? পৃথিবীর মাটিতে জন্মিয়াও তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে যে অপার্থিব গুণগ্রাম ! কবিকে দেখাইতে হইবে সীতা-চরিত্রে এই স্বর্গ-মর্ত্যের রাখী বন্ধন ! তাই মধুসূদন কখনও জানকীকে তুলসীর সহিত, কখনও বা তাঁহার মধুর ভাষণকে গোমুখীর মুখনিঃসৃত পূত বারিধারার সহিত উপমিত করিয়া তাঁহার পবিত্র জানকী-উপাখ্যানটিকে স্বর্গীয় সৌরভে সুরভিত করিয়াছেন ; আবার তাঁহাকে কাঁদাইয়া হাসাইয়া কৌতুকে ভাসাইয়া আমাদেরই বাঙালী ঘরের এক সতী-সাধ্বী নারীরূপের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন।